# VISVA-BHARATI

BULLETIN No. 20

## EDUCATION NATURALISED

( *In Bengali* )

( *Papers read at the Education Week Conference in Calcutta under the auspices of the the New Education Fellowship on the 8th. February, 1936.* )

February, 1936

Price Annas Eight Only.

# শিক্ষার স্বাঙ্গীকরণ
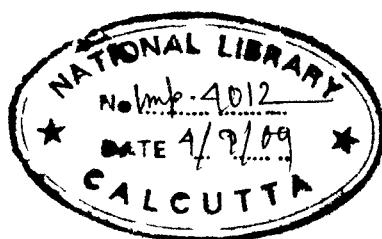


রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

# শিক্ষার স্বাঙ্গীকরণ
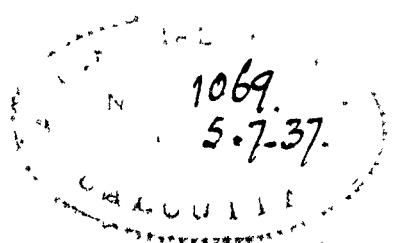
আমাদের দেশের আর্থিক দারিদ্র্য দুঃখের বিষয়, লজ্জার বিষয় আমাদের দেশের শিক্ষার অকিঞ্চিৎকরত্ব। এই অকিঞ্চিৎকরত্বের মূলে আছে আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থার অস্বাভাবিকতা, দেশের মাটির সঙ্গে এই ব্যবস্থার বিচ্ছেদ। চিত্তবিকাশের যে আয়োজনটা স্বভা-বতই সকলের চেয়ে আপন হওয়া উচিত ছিল সেইটেই রয়েছে সব চেয়ে পর হয়ে, তার সঙ্গে আমাদের দড়ির যোগ হয়েছে নাড়ীর যোগ হয় নি; এর ব্যর্থতা আমা-দের স্বাজাতিক ইতিহাসের শিকড়কে জীর্ণ করছে, খর্ব্ব করে দিচ্চে সমস্ত জাতির মানসিক পরিবৃদ্ধিকে। দেশের বহুবিধ অতি-প্রয়োজনীয় বিধিব্যবস্থায় অনাত্মীয়তার দুঃসহ ভার অগত্যাই চেপে রয়েছে; আইন, আদালত, সকল প্রকার সরকারী কার্য্যবিধি, যা বহুকোটি ভারতবাসীর ভাগ্য চালনা করে তা সেই বহুকোটি ভারতবাসীর পক্ষে সম্পূর্ণ দুর্বোধ দুর্গম। আমাদের ভাষা, আমাদের আর্থিক অবস্থা, আমাদের অনিবার্য্য অশিক্ষার সঙ্গে রাষ্ট্রশাসনবিধির বিপুল

ব্যবধানবশত পদে পদে যে দুঃখ ও অপব্যয় ঘটে তার পরিমাণ প্রভূত। তবু বলতে পারি এহ বাহ্য। কিন্তু শিক্ষাব্যাপার দেশের প্রাণগত আপন জিনিস না হওয়া তার চেয়ে মর্ম্মান্তিক। ল্যাবরেটরিতে রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় উদ্ভাবিত কৃত্রিম অন্নে দেশের পেট ভরাবার মতো সেই চেষ্টা; অতি অল্পসংখ্যক পেটেই সেটা পৌঁছয়, এবং সেটাকে সম্পূর্ণ রক্তে পরিণত করবার শক্তি অতি অল্প পাকযন্ত্রেরই থাকে। দেশের চিত্তের সঙ্গে দেশের শিক্ষার এই দূরত্ব এবং সেই শিক্ষার অপমানজনক স্বল্পতা দীর্ঘকাল আমাকে বেদনা দিয়েছে; কেননা নিশ্চিত জানি সকল পরাশ্রয়তার চেয়ে ভয়াবহ শিক্ষায় পরধর্ম্ম। এ সম্বন্ধে বরাবর আমি আলোচনা করেছি,—আবার তার পুনরুক্তি করতে প্রবৃত্ত হলেম, যেখানে ব্যথা সেখানে বারবার হাত পড়ে। আমার এই প্রসঙ্গে পুনরুক্তি অনেকেই হয়তো ধরতে পারবেন না, কেননা অনেকেরই কানে আমার সেই পুরোনো কথা পৌঁছয় নি। যাঁদের কাছে পুনরুক্তি ধরা পড়বে তাঁরা যেন ক্ষমা করেন। কেননা আজ আমি দুঃখের কথা বল্‌তে এসেছি, নূতন কথা বল্‌তে আসি নি। আমাদের

দেশে ম্যালেরিয়া যেমন নিত্যই আপনার পুনরাবৃত্তি করতে থাকে আমাদের দেশের সকল সাংঘাতিক দুঃখগুলির সেই দশা। ম্যালেরিয়া অপ্রতিহার্য্য নয় একথায় যাদের নিশ্চিত বিশ্বাস, তাদেরই অজেয় ইচ্ছা ও প্রবল অধ্যবসায়ের কাছে ম্যালেরিয়া দৈববিহিত দুর্য্যোগের ছদ্মবেশ ঘুচিয়ে দিয়ে বিদায় গ্রহণ করে। অন্যশ্রেণীয় দুঃখও নিজের পৌরুষের দ্বারা প্রতিহত হোতে পারে এই বিশ্বাসের দোহাই পাড়বার কর্ত্তব্যতা স্মরণ ক'রে অপটু দেহ নিয়ে আজ এসেছি।

একদা একজন অব্যবসায়ী ভদ্রসন্তান তাঁর চেয়ে আনাড়ি এক ব্যক্তির বাড়ি তৈরি করবার ভার নিয়েছিলেন। মালমসলার জোগাড় হয়েছিল সেরা-দরের, ইমারতের গাঁথুনি হয়েছিল মজবুৎ, কিন্তু কাজ হয়ে গেলে প্রকাশ পেল সিঁড়ির কথাটা কেউ ভাবেই নি। শনির চক্রান্তে এমনতরো পৌরব্যবস্থা যদি কোনো রাজ্যে থাকে যেখানে একতলার লোকেব নিত্যবাস একতলাতেই, আর দোতলার লোকের দোতলায়, তবে সেখানে সিঁড়ির কথাটা ভাবা নিতান্তই বাহুল্য। কিন্তু আলোচিত পূর্ব্বোক্ত বাড়িটাতে সিঁড়িযোগে ঊর্দ্ধপথযাত্রায় একতলার

প্রয়োজন ছিল। এই ছিল তার উন্নতি লাভের একমাত্র উপায়।

এদেশে শিক্ষা-ইমারতে সিঁড়ির সংকল্প গোড়া থেকেই আমাদের রাজমিস্ত্রীর প্ল্যানে ওঠেনি। নিচের তলাটা উপরের তলাকে নিঃস্বার্থ ধৈর্য্যে শিরোধার্য্য করে নিয়েছে, তার ভার বহন করেছে কিন্তু সুযোগ গ্রহণ করেনি, দাম জুগিয়েছে, মাল আদায় করেনি।

আমার পূর্ব্বকার লেখায় এদেশের সিঁড়ি-হারা শিক্ষাবিধানে এই মস্ত ফাঁকটার উল্লেখ করে-ছিলুম। তা নিয়ে কোনো পাঠকের মনে কোনো-যে উদ্বেগ ঘটেছে তার প্রমাণ পাওয়া যায় না। তার কারণ অভ্রভেদী বাড়িটাই আমাদের অভ্যস্ত, তার গৌরবে আমরা অভিভূত, তার বুকের কাছটাতে উপর নিচে সম্বন্ধ স্থাপনের যে সিঁড়ির নিয়মটা ভদ্র নিয়ম সেটাতে আমাদের অভ্যাস হয়নি। সেইজন্যেই ইতিপূর্ব্বে আমার আলোচ্য বিষয়টা হয়তো সেলাম পেয়ে থাকবে কিন্তু আসন পায় নি। তবু আর একবার চেষ্টা দেখতে দোষ নেই, কেননা, ভিতরে ভিতরে কখন যে দেশের মনে হাওয়া বদল হয় পরীক্ষা না ক'রে তা বলা যায় না।

শিক্ষা সম্বন্ধে সব চেয়ে স্বীকৃত এবং সব চেয়ে উপেক্ষিত কথাটা এই, যে, শিক্ষা জিনিসটি জৈব, ওটা যান্ত্রিক নয়। এর সম্বন্ধে কার্য্য-প্রণালীর প্রসঙ্গ পরে আসতে পারে কিন্তু প্রাণক্রিয়ার প্রসঙ্গ সর্ব্বাগ্রে। ইন্‌ক্যুবেটর যন্ত্রটা সহজ নয় ব'লেই কৌশল এবং অর্থব্যয়ের দিক থেকে তার বিবরণ শুন্‌তে খুব মস্ত, কিন্তু মুর্‌গীর জীবধর্ম্মানুগত ডিম পাড়াটা সহজ ব'লেই বেশি কথা জোড়ে না, তবু সেটাই অগ্রগণ্য।

বেঁচে থাকার নিয়ত ইচ্ছা ও সাধনাই হচ্চে বেঁচে থাকার প্রকৃতিগত লক্ষণ। যে-সমাজে প্রাণের জোর আছে সে-সমাজ টিকে থাকবার স্বাভাবিক গরজেই আত্মরক্ষাঘটিত দুটি সর্ব্বপ্রধান প্রয়োজনের দিকে অক্লান্তভাবে সজাগ থাকে। অন্ন আর শিক্ষা, জীবিকা আর বিদ্যা। সমাজের উপরের থাকের লোক খেয়ে-প'রে পরিপুষ্ট থাকবে আর নিচের থাকের লোক অর্দ্ধাশনে বা অনশনে বাঁচে কি মরে সে সম্বন্ধে সমাজ থাকবে অচেতন এটাকে বলা যায় অর্দ্ধাঙ্গের পক্ষাঘাত। এই অসাড়তার ব্যামোটা বর্ব্বরতার ব্যামো।

পশ্চিম মহাদেশে আজ সর্ব্বব্যাপী অর্থসঙ্কটের

সঙ্গে সঙ্গে অন্নসঙ্কট প্রবল হয়েছে। এই অভাব নিবারণের জন্যে সেখানকার বিদ্বানের দল এবং গবর্মেণ্ট যে রকম অসামান্য দাক্ষিণ্য প্রকাশ করছেন, সে রকম উদ্বেগ এবং চেষ্টা আমাদের বহুসহিষ্ণু বুভুক্ষার অভিজ্ঞতায় সম্পূর্ণ অপরিচিত। এ নিয়ে বড়ো বড়ো অঙ্কের ঋণ স্বীকার করতেও তাঁদের সঙ্কোচ দেখিনে। আমাদের দেশে দুবেলা দুমুঠো খেতে পায় অতি অল্প লোক, বাকি বারো আনা লোক আধপেটা খেয়ে ভাগ্যকে দায়ী করে এবং জীবিকার কৃপণ পথ থেকে মৃত্যুর উদার পথে সরে পড়তে বেশি দেরি করে না। এর থেকে যে নির্জ্জীবতার সৃষ্টি হয়েছে তার পরিমাণ কেবল মৃত্যুসংখ্যার তালিকা দিয়ে নিরূপিত হোতে পারে না। নিরুৎসাহ, অবসাদ, অকর্ম্মণ্যতা রোগপ্রবণতা মেপে দেখবার প্রত্যক্ষ মানদণ্ড যদি থাকত, তাহোলে দেখতে পেতুম এদেশের একপ্রান্ত থেকে আর একপ্রান্ত জুড়ে' প্রাণকে ব্যঙ্গ করছে মৃত্যু, সে অতি কুৎসিত দৃশ্য, অত্যন্ত শোচনীয়। কোনো স্বাধীন সভ্য দেশ মৃত্যুর এরকম সর্ব্বনেশে নাট্যলীলা নিশ্চেষ্টভাবে স্বীকার করতেই পারে না, আজ তার প্রমাণ ভারতের বাইরে নানা-দিক থেকেই পাচ্ছি।

শিক্ষাসম্বন্ধেও সেই একই কথা। শিক্ষার অভিষেচন ক্রিয়া সমাজের উপরের স্তরকেই দুই এক ইঞ্চিমাত্র ভিজিয়ে দেবে আর নিচের স্তর-পরম্পরা নিত্যনীরস কাঠিন্যে সুদূরপ্রসারিত মরুময়তাকে ক্ষীণ আবরণে ঢাকা দিয়ে রাখবে এমন চিত্তঘাতী সুগভীর মূর্খতাকে কোনো সভ্য-সমাজ অলসভাবে মেনে নেয়নি। ভারতবর্ষকে মানতে বাধ্য করেছে আমাদের যে নির্ম্মম ভাগ্য তাকে শতবার ধিক্কার দিই।

এমন কোনো কোনো গ্রহ উপগ্রহ আছে যার এক অর্দ্ধেকের সঙ্গে অন্য অর্দ্ধেকের চিরস্থায়ী বিচ্ছেদ, সেই বিচ্ছেদ আলোক অন্ধকারের বিচ্ছেদ। তাদের একটা পিঠ সূর্য্যের অভিমুখে অন্য পিঠ সূর্য্য-বিমুখ। তেমনি ক'রে যে-সমাজের এক অংশে শিক্ষার আলোক পড়ে অন্য বৃহত্তর অংশ শিক্ষাবিহীন, সে-সমাজ আত্মবিচ্ছেদের অভিশাপে অভিশপ্ত। সেখানে শিক্ষিত অশিক্ষিতের মাঝখানে অসূর্য্যম্পশ্য অন্ধকারের ব্যবধান। দুই ভিন্ন জাতীয় মানুষের চেয়েও এদের চিত্তের ভিন্নতা আরো বেশি প্রবল। একই নদীর এক পারের স্রোত ভিতরে ভিতরে অন্য

পারের স্রোতের বিরুদ্ধ দিকে চলছে ; সেই উভয় বিরুদ্ধের পার্শ্ববর্ত্তিতাই এদের দূরত্বকে আরো প্রবলভাবে প্রমাণিত করে।

শিক্ষার ঐক্যযোগে চিত্তের ঐক্যরক্ষাকে সভ্য-সমাজমাত্রই একান্ত অপরিহার্য্য ব'লে জানে। ভারতের বাইরে নানাস্থানে ভ্রমণ করেছি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য মহাদেশে। দেখে এসেছি এশিয়ায় নব-জাগরণের যুগে সর্ব্বত্রই জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষা-প্রচারের দায়িত্ব একান্ত আগ্রহের সঙ্গে স্বীকৃত। বর্ত্তমান যুগের সঙ্গে যে সব দেশ চিত্তের ও বিত্তের আদানপ্রদান বুদ্ধিবিচারের সঙ্গে চালনা করতে না পারবে তারা কেবলি হটে যাবে, কোণ-ঠেসা হয়ে থাকবে—এই শঙ্কার কারণ দূর করতে কোনো ভদ্রদেশ অর্থাভাবের কৈফিয়ৎ মানেনি। আমি যখন রাশিয়ায় গিয়েছিলুম তখন সেখানে আট বছর মাত্র নূতন স্বরাজতন্ত্রের প্রবর্ত্তন হয়েছে, তার প্রথম-ভাগে অনেককাল বিদ্রোহে বিপ্লবে দেশ ছিল শান্তিহীন, অর্থসচ্ছলতা ছিলই না। তবু এই স্বল্পকালেই রাশিয়ার বিরাট রাজ্যে প্রজাসাধারণের মধ্যে যে অদ্ভুত দ্রুতগতিতে শিক্ষা বিস্তার হয়েছে

সেটা ভাগ্যবঞ্চিত ভারতবাসীর কাছে অসাধ্য ইন্দ্রজাল ব'লেই মনে হোলো।

শিক্ষার ঐক্যসাধন ন্যাশনল ঐক্যসাধনের মূলে, এই সহজ কথা সুস্পষ্ট ক'রে বুঝতে আমাদের দেরি হয়েছে তারও কারণ আমাদের অভ্যাসের বিকার। একদা মহাত্মা গোখ্‌লে যখন সার্ব্বজনিক অবশ্য-শিক্ষা প্রবর্ত্তনে উদ্যোগী হয়েছিলেন তখন সব চেয়ে বাধা পেয়েছিলেন বাংলা প্রদেশের কোনো কোনো গণ্যমান্য লোকের কাছ থেকেই। অথচ রাষ্ট্রীয় ঐক্যের আকাঙ্ক্ষা এই বাংলাদেশেই সব চেয়ে মুখর ছিল। শিক্ষার অনৈক্যে বিজড়িত থেকেও রাষ্ট্রিক উন্নতির পথে এগিয়ে চলা সম্ভবপর এই কল্পনা এ প্রদেশের মনে বাধা পায়নি, এই অনৈক্যের অভ্যাস এমনিই ছিল মজ্জাগত। অভ্যাসে চিন্তার যে জড়ত্ব আনে আমাদের দেশে তার আর একটা দৃষ্টান্ত ঘরে ঘরেই আছে। আহারে কুপথ্য বাঙালির প্রাত্যহিক, বাঙালির মুখ-রোচক; সেটা আমাদের কাছে এতই সহজ হয়ে গেছে যে, যখন দেহটার আধমরা দশা বিচার করি তখন ডাক্তারের কথা ভাবি, ওষুধের কথা ভাবি, হাওয়া-

বদলের কথা ভাবি, তুক্‌তাক্‌ মন্ত্রতন্ত্রের কথা ভাবি, এমন কি, বিদেশী শাসনকেও সন্দেহ করি কিন্তু পথ্যসংস্কারের কথা মনেও আসে না। নৌকোটার নোঙর থাকে মাটি আঁক্‌ড়িয়ে, সেটা চোখে পড়ে না, মনে করি পালটা ছেঁড়া ব'লেই পার-ঘাটে পৌঁছনো হচ্চে না।

আমার কথার জবাবে এমন তর্ক হয়তো উঠবে, আমাদের দেশে সমাজ পূর্ব্বেও তো সজীব ছিল, আজও একেবারে মরেনি—তখনো কি আমাদের দেশ শিক্ষায় অশিক্ষায় যেন জলে স্থলে বিভক্ত ছিল না? তখনকার টোলে চতুষ্পাঠীতে তর্কশাস্ত্র ব্যাকরণশাস্ত্রের যে প্যাঁচ-কষাকষি চল্‌ত সে তো ছিল পণ্ডিত পালোয়ানদের ওস্তাদি আখড়াতেই বদ্ধ, তার বাইরে যে বৃহৎ দেশটা ছিল সেও কি সর্ব্বত্র ঐ রকম পালোয়ানি কায়দায় তাল ঠুকে' পায়তাড়া ক'রে বেড়াত? যা ছিল বিদ্যানামধারী পরিণত গজের বপ্রক্রীড়া, সেই দিগ্‌গজ পণ্ডিতী তো তার শুঁড় আস্ফালন করেনি দেশের ঘরে ঘরে।—কথাটা মেনে নিলুম। বিদ্যার যে আড়ম্বর নিরবচ্ছিন্ন পাণ্ডিত্য, সকল দেশেই সেটা প্রাণের ক্ষেত্র থেকে দূরবর্ত্তী,

পাশ্চাত্য দেশেও স্থূল পদবিক্ষেপে তার চলন আছে, তাকে বলে পেডিগ্রি। আমার বক্তব্য এই যে, এদেশে একদা বিদ্যার যে-ধারা সাধনার দুর্গম তুঙ্গ শৃঙ্গ থেকে নির্ঝরিত হোত সেই একই ধারা সংস্কৃতি-রূপে দেশকে সকল স্তরেই অভিষিক্ত করেছে। এজন্যে যান্ত্রিক নিয়মে এডুকেশন ডিপার্টমেণ্টের কারখানা-ঘর বানাতে হয়নি, দেহে যেমন প্রাণশক্তির প্রেরণায় মোটা ধমনীর রক্তধারা নানা আয়তনের বহুসংখ্যক শিরা উপশিরা যোগে সমস্ত দেহে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে প্রবাহিত হোতে থাকে, তেমনি ক'রেই আমাদের দেশের সমস্ত সমাজ-দেহে একই শিক্ষা স্বাভাবিক প্রাণপ্রক্রিয়ায় নিরন্তর সঞ্চারিত হয়েছে—নাড়ীর বাহনগুলি কোনোটা বা স্থূল কোনোটা বা অতি সূক্ষ্ম, কিন্তু তবু তারা এক-কলেবর ভুক্ত নাড়ী, এবং রক্তও একই প্রাণভরা রক্ত।

অরণ্য যে-মাটি থেকে প্রাণরস শোষণ ক'রে বেঁচে আছে, সেই মাটিকে আপনিই প্রতিনিয়ত প্রাণের উপাদান অজস্র জুগিয়ে থাকে। তাকে কেবলি প্রাণময় ক'রে তোলে। উপরের ডালে যে-ফল সে ফলায় নিচের মাটিতে তার আয়োজন তার

নিজকৃত। অরণ্যের মাটি তাই হয়ে ওঠে আরণ্যক, নইলে সে হোত বিজাতীয় মরু। যেখানে মাটিতে সেই উদ্ভিদ-সার পরিব্যাপ্ত নয় সেখানে গাছপালা বিরল হয়ে জন্মায়, উপবাসে বেঁকে চুরে শীর্ণ হয়ে থাকে। আমাদের সমাজের বনভূমিতে একদিন উচ্চশীর্ষ বনস্পতির দান নিচের ভূমিতে নিত্যই বর্ষিত হোত। আজ দেশে যে পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রবর্ত্তিত হয়েছে মাটিকে সে দান করেছে অতি সামান্য, ভূমিকে সে আপন উপাদানে উর্ব্বরা করে তুল্ছে না। জাপান প্রভৃতি দেশের সঙ্গে আমাদের এই প্রভেদটাই লজ্জাজনক এবং শোকাবহ। আমাদের দেশ আপন শিক্ষার ভূমিকাসৃষ্টি সম্বন্ধে উদাসীন। এখানে দেশের শিক্ষা এবং দেশের বৃহৎমন পরস্পর বিচ্ছিন্ন। সেকালে আমাদের দেশের মস্ত মস্ত শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতের সঙ্গে নিরক্ষর গ্রামবাসীর মনঃপ্রকৃতির বৈপরীত্য ছিল না। সেই শাস্ত্রজ্ঞানের প্রতি তাদের মনের অভিমুখিতা তৈরি হয়ে গিয়েছিল,—সেই ভোজে অৰ্দ্ধভোজন তাদের ছিল নিত্য, কেবল ঘ্রাণে নয়, উদ্বৃত্ত উপভোগে।

কিন্তু সায়ান্সে-গড়া পাশ্চাত্যবিদ্যার সঙ্গে

আমাদের দেশের মনের যোগ হয়নি—জাপানে সেটা হয়েছে পঞ্চাশ বছরের মধ্যে,—তাই পাশ্চাত্য শিক্ষার ক্ষেত্রে জাপান স্বরাজের অধিকারী। এটা তার পাস-করা বিদ্যা নয়, আপন-করা বিদ্যা। সাধারণের কথা ছেড়ে দেওয়া যাক্, সায়ান্সে ডিগ্রিধারী পণ্ডিত এদেশে বিস্তর আছে যাদের মনের মধ্যে সায়ান্সের জমিনটা তল্‌তলে; তাড়াতাড়ি যা' তা' বিশ্বাস করতে তাদের অসাধারণ আগ্রহ; মেকি সায়ান্সের মন্ত্র পড়িয়ে অন্ধ সংস্কারকে তারা সায়ান্সের জাতে তুল্‌তে কুণ্ঠিত হয় না। অর্থাৎ শিক্ষার নৌকোতে বিলিতি দাঁড় বসিয়েছি, হাল লাগিয়েছি, দেখতে হয়েছে ভালো, কিন্তু সমস্ত নদীটার স্রোত উল্টো দিকে—নৌকো পিছিয়ে পড়ে আপনিই। আধুনিক কালে বর্ব্বর দেশের সীমানার বাইরে ভারতবর্ষই একমাত্র দেশ যেখানে শতকরা আটদশজনের মাত্র অক্ষর পরিচয় আছে। এমন দেশে ঘটা ক'রে বিদ্যাশিক্ষার আলোচনা করতে লজ্জা বোধ করি। দশজন মাত্র যার প্রজা তার রাজত্বের কথাটা চাপা দেওয়াই ভালো। বিশ্ববিদ্যালয় অক্সফোর্ডে আছে, কেম্ব্রিজে আছে, লণ্ডনে আছে। আমাদের দেশেও স্থানে

স্থানে আছে, পূর্ব্বোক্তের সঙ্গে এদের ভাবভঙ্গী ও বিশেষণের মিল দেখে আমরা মনে ক'রে বসি এরা পরস্পারের সবর্ণ,—যেন ওটিন-ক্রীম ও পাউডর মাখলেই মেমসাহেবের সঙ্গে সত্য সত্যই বর্ণভেদ ঘুচে যায়। বিশ্ববিদ্যালয় যেন তার ইমারতের দেওয়াল এবং নিয়মাবলীর পাকা প্রাচীরের মধ্যেই পর্য্যাপ্ত। অক্সফোর্ড কেম্ব্রিজ বল্‌তে শুধু ঐটুকুই বোঝায় না, তার সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত শিক্ষিত ইংলণ্ডকেই বোঝায়। সেইখানেই তারা সত্য, তারা মরীচিকা নয়। আর আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় হঠাৎ থেমে গেছে তার আপন পাকা প্রাচীরের তলাটাতেই। থেমে যে গেছে সে কেবল বর্ত্তমানের অসমাপ্তিবশত নয়; এখনো বয়স হয়নি ব'লে যে মানুষটি মাথায় খাটো তার জন্যে আক্ষেপ করবার দরকার নেই, কিন্তু যার ধাতের মধ্যেই সম্পূর্ণ বাড়বার জৈবধর্ম্ম নেই তাকে যেন গ্রেনেডিয়ারের স্বজাতীয় ব'লে কল্পনা না করি।

গোড়ায় যাঁরা এদেশে তাঁদের রাজতন্ত্রের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষাব্যবস্থার পত্তন করেছিলেন, দেখতে পাই তাঁদেরও উত্তরাধিকারীরা বাইরের আসবাব এবং ইঁট কাঠ চুন সুরকির প্যাটার্ন্‌ দেখিয়ে আমাদের

এবং নিজেদেরকে ভোলাতে আনন্দ বোধ করেন। কিছুকাল পূর্ব্বে একদিন কাগজে পড়েছিলুম, অন্য এক প্রদেশের রাজ্যসচিব বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিৎ পত্তনের সময় বলেছিলেন যে, যারা বলে ইমারতের বাহুল্যে আমরা শিক্ষার সম্বল খর্ব্ব করি তারা অবুঝ, কেননা শিক্ষা তো কেবল জ্ঞান লাভ নয়, ভালো দালানে ব'সে পড়াশুনো করা সেও একটা শিক্ষা। অর্থাৎ ক্লাসে বড়ো অধ্যাপকের চেয়ে বড়ো দেওয়ালটা বেশি বই কম নয়। আমাদের নালিশ এই যে, তলোয়ারটা যেখানে তালপাতার চেয়ে বেশি দামী করা অর্থাভাব-বশত অসম্ভব ব'লে সংবাদ পাই সেখানে তার খাপটাকে ইস্পাত দিয়ে বাঁধিয়ে দিলে আসল কাজ এগোয় না। তার চেয়ে ঐ ইস্পাতটাকে গলিয়ে একটা চলনসই গোছের ছুরি বানিয়ে দিলেও কতকটা সান্ত্বনার আশা থাকে।

আসল কথা, প্রাচ্য দেশে মূল্য বিচারের যে আদর্শ তাতে আমরা উপকরণকে অমৃতের সঙ্গে পাল্লা দেওয়ার দরকার বোধ করিনে। বিদ্যা জিনিষটি অমৃত, ইঁটকাঠের দ্বারা তার পরিমাপের কথা আমাদের মনেই হয় না। আন্তরিক সত্যের

দিকে যা বড়ো বাহ্যরূপের দিকে তার আয়োজন আমাদের বিচারে না হোলেও চলে। অন্তত এতকাল সেই রকমই আমাদের মনের ভাব ছিল। বস্তুত আমাদের দেশের প্রাচীন বিশ্ববিদ্যালয় আজও আছে বারাণসীতে। অত্যন্ত সত্য, নিতান্ত স্বাভাবিক, অথচ মস্ত ক'রে চোখে পড়ে না। এদেশের সনাতন সংস্কৃতির মূল উৎস সেইখানেই, কিন্তু তার সঙ্গে না আছে ইমারৎ, না আছে অতি জটিল ব্যয়সাধ্য ব্যবস্থা-প্রণালী। সেখানে বিদ্যাদানের চিরন্তন ব্রত দেশের অন্তরের মধ্যে অলিখিত অনুশাসনে লেখা। বিদ্যাদানের পদ্ধতি, তার নিস্বার্থ নিষ্ঠা, তার সৌজন্য, তার সরলতা, গুরুশিষ্যের মধ্যে অকৃত্রিম হৃদ্যতার সম্বন্ধ সর্ব্বপ্রকার আড়ম্বরকে উপেক্ষা করে এসেছে, কেননা সত্যেই তার পরিচয়। প্রাচ্যদেশের কারিগররা যে রকম অতি সামান্য হাতিয়ার দিয়ে অতি অসামান্য শিল্পদ্রব্য তৈরি ক'রে থাকে পাশ্চাত্য বুদ্ধি তা কল্পনা করতে পারে না। যে নৈপুণ্যটি ভিতরের জিনিষ তার বাহন প্রাণে এবং মনে। বাইরের স্থূল উপাদানটি অত্যন্ত হয়ে উঠলে আসল জিনিষটি চাপা পড়ে।

দুর্ভাগ্যক্রমে এই সহজ কথাটা আমরাই আজকাল পাশ্চাত্যের চেয়েও কম বুঝি। গরীব যখন ধনীকে মনে মনে ঈর্ষ্যা করে তখন এই রকমই বুদ্ধি-বিকার ঘটে। কোনো অনুষ্ঠানে যখন আমরা পাশ্চাত্যের অনুকরণ করি তখন ইঁট কাঠের বাহুল্যে এবং যন্ত্রের চক্রে উপচক্রে নিজেকে ও অন্যকে ভুলিয়ে গৌরব করা সহজ। আসল জিনিষের কার্পণ্যে এইটেরই দরকার হয় বেশি। আসলের চেয়ে নকলের সাজসজ্জা স্বভাবতই যায় বাহুল্যের দিকে। প্রত্যহই দেখতে পাই পূর্ব্বদেশে জীবন-সমস্যার আমরা যে সহজ সমাধান করেছিলুম তার থেকে কেবলি আমরা স্খলিত হচ্চি। তার ফলে হোলো এই যে, আমাদের অবস্থাটা রয়ে গেল পূর্ব্ববৎ, এমন কি, তার চেয়ে কয়েক ডিগ্রি নিচের দিকে, অথচ আমাদের মেজাজটা ধার করে এনেছি অন্য দেশ থেকে যেখানে সমারোহের সঙ্গে তহবিলের বিশেস আড়াআড়ি নেই।

মনে ক'রে দেখো না, এদেশে বহু রোগজর্জ্জর জনসাধারণের আরোগ্য বিধানের জন্যে রিক্ত রাজ-কোষের দোহাই দিয়ে ব্যয়সঙ্কোচ করতে হয়, দেশ-

জোড়া অতি বিরাট মূর্খতার কালিমা যথোচিত পরিমার্জ্জন করতে অর্থে কুলোয় না, অর্থাৎ যে সব অভাবে দেশ অন্তরে বাহিরে মৃত্যুর তলায় তলাচ্চে তার প্রতিকারের অতি ক্ষীণ উপায় দেউলে দেশের মতোই, অথচ এদেশে শাসনব্যবস্থায় ব্যয়ের অজস্র প্রাচুর্য্য একেবারেই দরিদ্র দেশের মতো নয়। তার ব্যয়ের পরিমাণ স্বয়ং পাশ্চাত্য ধনী দেশকেও অনেক-দূর এগিয়ে গেছে। এমন কি, বিদ্যাবিভাগের সমস্ত বাহ্য ঠাট বজায় রাখবার ব্যয় বিদ্যা-পরিবেষণের চেয়ে বেশি। অর্থাৎ গাছের পাতাকে দর্শনধারী আকারে ঝাঁকড়া ক'রে তোলবার খাতিরে ফল ফলাবার রস জোগানে টানাটানি চলেছে। তাহোক্, এর এই বাইরের দিকের অভাবের চেয়ে এর মর্ম্মগত গুরুতর অভাবটাই সব চেয়ে দুশ্চিন্তার বিষয়। সেই কথাটাই বল্‌তে চাই। সেই অভাবটা শিক্ষার যথাযোগ্য আধারের অভাব।

আজকালকার অস্ত্র-চিকিৎসায় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে বাইরে থেকে জোড়া লাগাবার কৌশল ক্রমশই উৎকর্ষ লাভ করছে। কিন্তু বাইরে থেকে জোড়-লাগা জিনিষটা সমস্ত কলেবরের সঙ্গে প্রাণের মিলে

মিলিত না হোলে সেটাকে সুচিকিৎসা বলে না। তার ব্যাণ্ডেজ-বন্ধনের উত্তরোত্তর প্রভূত পরিস্ফীতি দেখে স্বয়ং রোগীর মনেও গর্ব্ব এবং তৃপ্তি হোতে পারে কিন্তু মুমূর্ষু প্রাণপুরুষের এতে সান্ত্বনা নেই। শিক্ষা-সম্বন্ধে এই কথাটা পূর্ব্বেই বলেছি। বলেছি, বাইরের থেকে আহরিত শিক্ষাকে সমস্ত দেশ যতক্ষণ আপন করতে না পারবে ততক্ষণ তার বাহ্য-উপকরণের দৈর্ঘ্যপ্রস্থ্যের পরিমাপটাকে হিসাবের খাতায় লাভের কোঠায় ফেল্‌লে হুণ্ডিকাটা ধারের টাকাটাকে মূলধনহারা ব্যবসায়ে মুনফা ব'লে আনন্দ করার মতো হয়। সেই আপন করবার সর্ব্বপ্রধান সহায় আপন ভাষা। শিক্ষার সকল খাদ্য ঐ ভাষার রসায়নে আমাদের আপন খাদ্য হয়। পক্ষিশাবক গোড়া থেকেই পোকা খেয়ে মানুষ; কোনো মানব-সমাজে হঠাৎ যদি কোনো পক্ষিমহারাজের একাধি-পত্য ঘটে তাহোলেই কি এমন কথা বলা চলবে যে, সেই রাজখাদ্যটা খেলেই মানুষ-প্রজাদেরও পাখা গজিয়ে উঠবে?

শিক্ষায় মাতৃভাষাই মাতৃদুগ্ধ, জগতে এই সর্ব্বজন-স্বীকৃত নিরতিশয় সহজ কথাটা বহুকাল পূর্ব্বে

একদিন বলেছিলেম আজও তার পুনরাবৃত্তি করব। সেদিন যা ইংরেজি শিক্ষার মন্ত্রমুগ্ধ কর্ণকুহরে অশ্রাব্য হয়েছিল আজও যদি তা লক্ষ্যভ্রষ্ট হয় তবে আশা করি পুনরাবৃত্তি করবার মানুষ বারে বারে পাওয়া যাবে।

আপন ভাষায় ব্যাপকভাবে শিক্ষার গোড়াপত্তন করবার আগ্রহ স্বভাবতই সমাজের মনে কাজ করে, এটা তার সুস্থ চিত্তের লক্ষণ। রামমোহন রায়ের বন্ধু পাদ্রি এডাম সাহেব বাংলা দেশের প্রাথমিক শিক্ষার যে রিপোর্ট প্রকাশ করেন তাতে দেখা যায় বাংলা বিহারে একলক্ষের উপর পাঠশালা ছিল; দেখা যায়, প্রায় প্রত্যেক গ্রামেই ছিল জনসাধারণকে অন্তত ন্যূনতম শিক্ষাদানের ব্যবস্থা। এছাড়া, প্রায় তখনকার ধনীমাত্রেই আপন চণ্ডীমণ্ডপে সামাজিক কর্ত্তব্যের অঙ্গরূপে পাঠশালা রাখতেন, গুরুমশায় বৃত্তি ও বাসা পেতেন তাঁরই কাছ থেকে। আমার প্রথম অক্ষর-পরিচয় আমাদেরই বাড়ির দালানে, প্রতিবেশী পোড়োদের সঙ্গে। মনে আছে, এই দালানের নিভৃত খ্যাতিহীনতা ছেড়ে আমার সতীর্থ আত্মীয় দুজন যখন অশ্বরথ-যোগে সরকারী

বিদ্যালয়ে প্রবেশাধিকার পেলেন তখন মান-হানির দুঃসহ দুঃখে অশ্রুপাত করেছি এবং গুরুমশায় আশ্চর্য্য ভবিষ্যৎ দৃষ্টির প্রভাবে বলেছিলেন, ঐখান থেকে ফিরে আসবার ব্যর্থপ্রয়াসে আরো অনেক বেশি অশ্রু আমাকে ফেলতে হবে। তখনকার প্রথম শিক্ষার জন্য শিশুশিক্ষা প্রভৃতি যে-সকল পাঠ্যপুস্তক ছিল, মনে আছে অবকাশকালেও বার বার তার পাতা উল্‌টিয়েছি। এখনকার ছেলেদের কাছে তার প্রত্যক্ষ পরিচয় দিতে কুণ্ঠিত হব কিন্তু সমস্ত দেশের শিক্ষাপরিবেষণের স্বাভাবিক ইচ্ছা ঐ অত্যন্ত গরীবভাবে ছাপানো বইগুলির পত্রপুটে রক্ষিত ছিল—এই মহৎ গৌরব এখনকার কোনো শিশুপাঠ্য বইয়ে পাওয়া যাবে না। দেশের খাল বিল নদী-নালায় আজ জল শুকিয়ে এল তেমনি রাজার অনাদরে আধমরা হয়ে এল সর্ব্বসাধারণের নিরক্ষরতা দূর করবার স্বাদেশিক ব্যবস্থা।

দেশে বিদ্যাশিক্ষার যে সরকারী কারখানা আছে তার চাকায় সামান্য কিছু বদল করতে হোলে অনেক হাতুড়ি পেটাপিটির দরকার হয়। সে খুব শক্ত হাতের কর্ম্ম। সেই শক্ত হাতই ছিল আশু মুখুজ্জে-

মশায়ের। বাঙালির ছেলে ইংরেজি বিদ্যায় যতই পাকা হোক্ তবু শিক্ষা পূরো করবার জন্যে তাকে বাংলা শিখতেই হবে, ঠেলা দিয়ে মুখুজ্জেমশায় বাংলার বিশ্ববিদ্যালয়কে এতটা দূর পর্য্যন্ত বিচলিত করে-ছিলেন। হয়তো ঐ পথটায় তার চলৎশক্তির সূত্রপাত করে দিয়েছেন, হয়তো তিনি বেঁচে থাক্‌লে চাকা আরো এগোত। হয়তো সেই চালনার সঙ্কেত মন্ত্রণাসভার দফ্‌তরে এখনো পরিণতির দিকে উন্মুখ আছে।

তবু আমি যে আজ উদ্বেগ প্রকাশ করছি তার কারণ, বিশ্ববিদ্যালয়ের যানবাহনটা অত্যন্ত ভারী এবং বাংলা ভাষার পথ এখনো কাঁচা পথ। এই সমস্যা সমাধান দুরূহ ব'লে পাছে হোতে-করতে এমন একটা অতি অস্পষ্ট ভাবীকালে তাকে ঠেলে দেওয়া হয় যা অসম্ভাবিতের নামান্তর—এই আমাদের ভয়। আমাদের গতি মন্দাক্রান্তা, কিন্তু আমাদের অবস্থাটা সবুর করবার মতো নয়। তাই আমি বলি, পরিপূর্ণ সুযোগের জন্যে সুদীর্ঘকাল অপেক্ষা না ক'রে অল্প বহরে কাজটা আরম্ভ ক'রে দেওয়া ভালো, যেমন ক'রে চারাগাছ রোপণ করে সেই সহজ ভাবে। অর্থাৎ

তার মধ্যে সমগ্র গাছেরই আদর্শ আছে, বাড়তে বাড়তে দিনে দিনে সেই আদর্শ সম্পূর্ণ হয়। বয়স্ক ব্যক্তির পাশে শিশু যখন দাঁড়ায় সে আপন সমগ্রতার সম্পূর্ণ ইঙ্গিত নিয়েই দাঁড়ায়। এমন নয় একটা ঘরে বছর দুয়েক ধ'রে ছেলেটার কেবল পা-খানা তয়ের হচ্চে, আর একটা ঘরে এগিয়েছে হাতের কনুইটা পর্য্যন্ত। এতদূর অত্যন্ত সতর্কতা সৃষ্টিকর্ত্তার নেই। সৃষ্টির ভূমিকাতেও অপরিণতি সত্ত্বেও সমগ্রতা থাকে।

তেমনি বাংলা-বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি সজাব সমগ্র শিশুমূর্ত্তি দেখতে চাই। সে মূর্ত্তি কারখানা ঘরে তৈরি খণ্ড-খণ্ড বিভাগের ক্রমশ যোজনা নয়। বয়স্ক বিদ্যালয়ের পাশে এসেই সে দাঁড়াক্ বালক-বিদ্যালয় হয়ে। তার বালক মূর্ত্তির মধ্যেই দেখি তার বিজয়ী মূর্ত্তি, দেখি ললাটে তার রাজাসন অধিকারের প্রথম টিকা।

বিদ্যালয়ের কাজে যাঁরা অভিজ্ঞ তাঁরা জানেন একদল ছাত্র স্বভাবতই ভাষাশিক্ষায় অপটু। ইংরেজি ভাষায় অনধিকার সত্ত্বেও যদি তারা কোনোমতে ম্যাট্রিকের দেউড়িটা পেরিয়ে যায়, উপরের সিঁড়ি

ভাঙবার বেলায় ব'সে পড়ে, আর ঠেলে তোলা যায় না।

এই দুর্গতির অনেকগুলো কারণ আছে। একে তো যে ছেলের মাতৃভাষা বাংলা, ইংরেজি ভাষার মতো বালাই তার আর নেই। ও যেন বিলিতি তলোয়ারের খাপে দিশি খাঁড়া ভরবার কস্‌রৎ। তার পরে, গোড়ার দিকে ভালো শিক্ষকের কাছে ভালো নিয়মে ইংরেজি শেখার সুযোগ অল্প ছেলেরই হয়, গরিবের ছেলের তো হয়ই না। তাই অনেক স্থলেই বিশল্য-করণীর পরিচয় ঘটে না ব'লেই গোটা ইংরেজি বই মুখস্থ করা ছাড়া উপায় থাকে না। সে রকম ত্রেতাযুগীয় বীরত্ব ক'জন ছেলের কাছে আশা করা যায়।

শুধু এই কারণেই কি তারা বিদ্যামন্দির থেকে অণ্ডমানে চালান যাবার উপযুক্ত? ইংলণ্ডে একদিন চুরির অপরাধ ছিল ফাঁসি, এ যে তার চেয়েও কড়া আইন, এ যে চুরি করতে পারে না ব'লেই ফাঁসি। না বুঝে বই মুখস্থ ক'রে পাস করা কি চুরি ক'রে পাস করা নয়? পরীক্ষাগারে বইখানা চাদরের মধ্যে নিয়ে গেলেই চুরি, আর মগজের মধ্যে করে নিয়ে

গেলে তাকে কী বল্‌ব ? আস্ত-বই-ভাঙা উত্তর বসিয়ে যারা পাস করে তারাই তো চোরাই কড়ি দিয়ে পারানি জোগায়।

তা হোক্‌, যে উপায়েই তারা পার হোক্‌ নালিশ করতে চাই নে। তবু এ প্রশ্নটা থেকে যায় যে, বহু সংখ্যক যে-সব হতভাগা পার হোতে পারল না তাদের পক্ষে হাওড়ার পুলটাই না হয় ছু-ফাঁক হয়েছে কিন্তু কোনো রকমেরই সরকারী খেয়াও কি তাদের কপালে জুটবে না, একটা লাইসেন্স্‌-দেওয়া পান্‌সি, মোটর-চালিত নাইবা হোলো, না হয় হোলো দিশি হাতে দাঁড়-টানা ?

অন্য স্বাধীন দেশের সঙ্গে আমাদের একটা মস্ত প্রভেদ আছে। সেখানে শিক্ষার পূর্ণতার জন্যে যারা দরকার বোঝে তারা বিদেশী ভাষা শেখে। কিন্তু বিদ্যার জন্যে যেটুকু আবশ্যক তার বেশি তাদের না শিখলেও চলে। কেননা তাদের দেশের সমস্ত কাজই নিজের ভাষায়। আমাদের দেশের অধিকাংশ কাজই ইংরেজি ভাষায়। যাঁরা শাসন করেন তাঁরা আমাদের ভাষা শিখতে, অন্তত যথেষ্ট পরিমাণে শিখতে, বাধ্য নন। পর্ব্বত নড়েন না, কাজেই সচল

মানুষকেই প্রয়োজনের গরজে পর্ব্বতের দিকে নড়তে হয়। ইংরেজি ভাষা কেবল যে আমাদের জানতে হবে তা নয়, তাকে ব্যবহার করতে হবে। সেই ব্যবহার বিদেশী আদর্শে যতই নিখুঁৎ হবে সেই পরিমাণেই স্বদেশীদের এবং কর্ত্তাদের কাছে আমাদের সমাদর। আমি একজন ইংরেজ ম্যাজিষ্ট্রেটকে জানতুম; তিনি বাংলা সহজেই পড়তে পারতেন। বাংলা সাহিত্যে তাঁর রুচির আমি প্রশংসা করবই কারণ রবীন্দ্রনাথের রচনা তিনি পড়তেন এবং পড়ে আনন্দ পেতেন। একবার গ্রামবাসীদের এক সভায় তিনি উপস্থিত ছিলেন। গ্রামহিতৈষী বাঙালি বক্তাদের মধ্যে যাঁর যা বক্তব্য ছিল বলা হোলে পর ম্যাজিষ্ট্রেটের মনে হোলো, গ্রামের লোককে বাংলায় কিছু বলা তাঁরও কর্ত্তব্য। কোনো প্রকারে দশ মিনিট কর্ত্তব্য পালন করেছিলেন। গ্রামের লোকেরা বাড়ি ফিরে গিয়ে আত্মীয়দের জানালো যে, সাহেবের ইংরেজি বক্তৃতা এইমাত্র তারা শুনে এসেছে। পরভাষা ব্যবহার সম্বন্ধে বিদেশীর কাছে খুব বেশি আশা না করলেও তাকে অসম্মান করা হয় না। ম্যাজিষ্ট্রেট নিজেই

জান্‌তেন তাঁর বাংলা কথনের ভাষা এমন নয় যে, গৌড়জন আনন্দে যাহার অর্থবোধ করতে পারে সম্যক্। তাই নিয়ে তিনি হেসেও ছিলেন। আমরা হোলে কিছুতেই হাসতে পারতুম না, ধরণীকে অনুনয় করতুম দ্বিধা হোতে। ইংরেজি সম্বন্ধে আমাদের বিদেশিত্বের কৈফিয়ৎ আত্মায় বা অনাত্মীয় সমাজে গ্রাহ্য হয় না। একদা বিশ্ববিখ্যাত জর্ম্মান তত্ত্বজ্ঞানী অয়কেনের ইংরেজি বক্তৃতা শুনেছিলেম। আশা করি এ কথাটা অত্যুক্তি ব'লে মনে করবেন না যে, ইংরেজি শুন্‌লে আমি বুঝতে পারি—সেটা ইংরেজি। কিন্তু অয়কেনের ইংরেজি শুনে আমার ধাঁধাঁ লেগেছিল। এ নিয়ে অয়কেনকে অবজ্ঞা করতে কেউ পারে নি। কিন্তু এই দশা আমার হোলে কী হোত সে কথা কল্পনা করলেও কর্ণমূল রক্তবর্ণ হয়ে ওঠে। বাবু-ইংলিশ নামে নিরতিশয় অবজ্ঞাসূচক একটা শব্দ ইংরেজিতে আছে, কিন্তু ইংরেজি-বাংলা তার চেয়ে বহুগুণে বিকৃত হোলেও ওটাকে অনিবার্য্য ব'লে মেনে নিই, অবজ্ঞা করতে পারিনে। আমাদের কারো ইংরেজিতে ত্রুটি হোলে দেশের লোকের কাছে সেটা যেমন হসনীয় হয় এমন কোনো প্রহসন হয় না।

সেই হাসির মধ্য থেকে পরাধীনতারই কলঙ্ক দেখা দেয় কালো হয়ে। যতদিন আমাদের এই দশা বহাল থাকবে ততদিন আমাদের শিক্ষাভিমানীকে কেবল যথেষ্ট ইংরেজি নয়, অতিরিক্ত ইংরেজি শিখতে হবে। তাতে যে অতিরিক্ত সময় লাগে সেই সময়টা যথোচিত শিক্ষার হিসাব থেকে কাটা যায়। তা হোক্, অত্যাবশ্যকের চেয়ে অতিরিক্তকে যতদিন আমাদের মেনে চল্‌তেই হবে ততদিন ইংরেজি ভাষায় পেটাই-করা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজাতীয় ভার আমাদের আগাগোড়াই বহন করা অনিবার্য্য। কেননা ভালো ক'রে বাংলা শেখার দ্বারাতেই ভালো ক'রে ইংরেজি শেখার সহায়তা হোতে পারে একথা মনে করতে সাহস হবে না। গরজটা অতিশয় জরুরি তাই মন বল্‌তে থাকে কী জানি! আমার সেই অভিভাবকের মতো অভিভাবক বাংলা দেশে বেশি পাওয়া যাবে না, তাই বেশি দাবী ক'রে লাভ নেই। বাংলা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের একেশ্বরত্বের অধিকার আজ সহ্য হবে না। নূতন স্বাধীনতার দাবীকে পুরাতন অধীনতার সেফ্‌গার্ডসের দ্বারা বেড়া তুলে দেবার আশ্বাস না দিতে পারলে সবটাই ফেঁসে যেতে পারে এই আমার

ভয়। তাই বল্‌ছি, আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিতরের দালানে বিদ্যার ভোজের যে-আয়োজন চল্‌ছে তার রান্নাটা বিলিতি মস্‌লায়, বিলিতি ডেক্‌চিতে, তার আহারটা বিলিতি আসনে বিলিতি পাত্রেই চলুক ; তার জন্যে প্রাণপণে আমরা যে মূল্য দিতে পারি তাতে ভূরি-ভোজের আশা করা চল্‌বে না। যারা কার্ড পেয়েছে তারা ভিতর মহলেই বসুক্‌ আর যারা রবাহূত বাইরের আঙিনায় তাদের জন্যে পাত পেড়ে দেওয়া যাক্‌ না। টেবিল পাতা নাই হোলো, কলা পাত পড়ুক।

বাংলা দেশে উচ্চ শিক্ষাকে চিরকাল অথবা অতি দীর্ঘকাল পরান্নভোজী পরাবসথশায়ী হয়ে থাকতেই হবে কেননা এ ভাষায় পাঠ্যপুস্তক নেই,—এই কঠিন তর্ক তুল্‌লে একদা সেটা কথা-কাটাকাটির ঘূর্ণি হাওয়াতেই আবর্ত্তিত হোতে পারত, দূর দেশ ছাড়া কাছের পাড়া থেকে দৃষ্টান্ত আহরণ ক'রে ঐ উৎপাতটাকে শান্ত করা যেতে পারত না। আজ হাতের কাছেই সুযোগ মিলেছে।

ভারতের অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনায় দক্ষিণ হায়দ্রাবাদ বয়সে অল্প, সেই জন্যই বোধ করি তার

সাহস বেশি, তা ছাড়া একথাও বোধ করি সেখানে স্বীকৃত হওয়া সহজ হয়েছে যে, শিক্ষাবিধানে কৃপণতা করার মতো নিজেকে ফাঁকি দেওয়া আর কিছুই হোতে পারে না। ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ে অবিচলিত নিষ্ঠার সহায়তায় আদ্যন্তমধ্যে উর্দ্দু ভাষার প্রবর্ত্তন হয়েছে। তারি প্রবল তাড়নায় ঐ ভাষায় পাঠ্যপুস্তক রচনা প্রায় পরিপূর্ণ হয়ে উঠল। ইমারৎও হোলো, সিঁড়িও হোলো; নিচে থেকে উপরে লোক-যাতায়াত চল্‌ছে। হোতে পারে, সেখানে যথেষ্ট সুযোগ ও স্বাধীনতা ছিল। কিন্তু তবুও চারিদিকের প্রচলিত মত ও অভ্যাসের দুস্তর বাধা অতিক্রম ক'রে যিনি এমন মহৎ সঙ্কল্পকে মনে এবং কাজের ক্ষেত্রে স্থান দিতে পেরেছেন সেই স্যর আক্‌বর হয়দরির সাহসকে ধন্য বলি। বিনা দ্বিধায় জ্ঞান-সাধনার দুর্গমতাকে তাঁদের মাতৃভাষার ক্ষেত্রে সমভূম করে দিয়ে উর্দ্দু-ভাষীদের তিনি যে মহৎ উপকার করেছেন তার দৃষ্টান্ত যদি আমাদের মন থেকে সংশয় দূর এবং শিক্ষা-সংস্কৃতির বিলম্বিত গতিকে ত্বরান্বিত করতে পারে তবে একদা আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় অন্য সকল সভ্য দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ের সমপর্য্যায়ে দাঁড়িয়ে

গৌরব করতে পারবে। নইলে প্রতিধ্বনি ধ্বনির সঙ্গে একই মূল্য দাবি করবে কোন্ স্পর্দ্ধায়? বনস্পতির শাখায় যে-পরগাছা ঝুল্ছে সে বনস্পতির সমতুল্য নয়।

বিদেশ থেকে যেখানে আমরা যন্ত্র কিনে এনে ব্যবহার করি সেখানে তার ব্যবহারে ভয়ে ভয়ে অক্ষরে অক্ষরে পুঁথি মিলিয়ে চল্তে হয় কিন্তু সজীব গাছের চারার মধ্যে তার আত্মচালনা আত্মপরিবর্দ্ধনার তত্ত্ব অনেক পরিমাণে ভিতরে ভিতরে কাজ করতে থাকে। যন্ত্র আমাদের স্বায়ত্ত হোতে পারে কিন্তু তাতে আমাদের স্বানুবর্ত্তিতা থাকে না। স্বাধীন পরিচালনার ক্ষেত্রে যেখানে ন্যাশনল কলেজ গড়া হয়েছে, হিন্দুবিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনায় যেখানে দেখা গেল অর্থব্যয় অজস্র হয়েছে, সেখানেও ছাঁচ-উপাসক আমরা ছাঁচের মুঠো থেকে আমাদের স্বাতন্ত্র্যকে কিছুতে ছাড়িয়ে নিতে পারছিনে। সেখানেও শুধু যে ইংরেজি য়ুনিভর্সিটির গায়ের মাপে ছেঁটে ছুঁটে কুর্ত্তি বানাচ্চি তা নয়, ইংরেজের জমি থেকে তার ভাষাসুদ্ধ উপ্ড়ে এনে দেশের চিত্তক্ষেত্রকে কোদালে কুড়ুলে ক্ষত বিক্ষত

ক'রে বিরুদ্ধ ভূমিতে তাকে রোপণের গলদ্‌ঘর্ম্ম চেষ্টা করছি ; তাতে শিকড় না ছড়াচ্চে চারিদিকে, না পৌঁছচ্চে গভীরে।

বাংলাভাষার দোহাই দিয়ে যে-শিক্ষার আলোচনা বারম্বার দেশের সামনে এনেছি তার মূলে আছে আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা। যখন বালক ছিলেম, আশ্চর্য্য এই যে, তখন অবিমিশ্র বাংলা ভাষায় শিক্ষা দেবার একটা সরকারী ব্যবস্থা ছিল। তখনো যে-সব স্কুলের রাস্তা ছিল কলকাতা য়ুনিভর্সিটির প্রবেশ-দ্বারের দিকে জ্‌স্তিত, যারা ছাত্রদের আবৃত্তি করাচ্ছিল he is up তিনি হন উপরে, যারা ইংরেজি I সর্ব্বনাম শব্দের ব্যাখ্যা মুখস্থ করাচ্ছিল, I by itself I তাদের আহ্বানে সাড়া দিচ্ছিল সেই সব পরিবারের ছাত্র যারা ভদ্রসমাজে উচ্চ-পদবীর অভিমান করতে পারত। এদেরই দূর পার্শ্বে সঙ্কুচিতভাবে ছিল প্রথমোক্ত শিক্ষাবিভাগ, ছাত্রবৃত্তির পোড়োদের জন্য। তারা কনিষ্ঠ অধি-কারী, তাদের শেষ সদ্গতি ছিল নর্ম্মাল স্কুল নামধারী মাথা-হেঁট-করা বিদ্যালয়ে। তাদের জীবিকার শেষ লক্ষ্য ছিল বাংলা বিদ্যালয়ে স্বল্পসন্তুষ্ট বাংলা পণ্ডিতী

ব্যবসায়ে। আমার অভিভাবক সেই নর্ম্মালস্কুলের দেউড়ি বিভাগে আমাকে ভর্ত্তি করেছিলেন। আমি সম্পূর্ণ বাংলা ভাষার পথ দিয়েই শিখেছিলেম ভূগোল ইতিহাস, গণিত, কিছু পরিমাণ প্রাকৃত বিজ্ঞান, আর সেই ব্যাকরণ যার অনুশাসনে বাংলা ভাষা সংস্কৃত ভাষার আভিজাত্যের অনুকরণে আপন সাধু ভাষার কৌলীন্য ঘোষণা করত। এই শিক্ষার আদর্শ ও পরিমাণ বিদ্যা হিসাবে তখনকার ম্যাট্রিকের চেয়ে কম দরের ছিল না। আমার বারো বৎসর বয়স পর্য্যন্ত ইংরেজি-বর্জ্জিত এই শিক্ষাই চলেছিল। তার পরে ইংরেজি বিদ্যালয়ে প্রবেশের অনতিকাল পরেই আমি ইস্কুলমাষ্টারের শাসন হতে ঊর্দ্ধশ্বাসে পলাতক।

এর ফলে শিশুকালেই বাংলা ভাষার ভাণ্ডারে আমার প্রবেশ ছিল অবারিত। সে ভাণ্ডারে উপকরণ যতই সামান্য থাক্ শিশু-মনের পোষণ ও তোষণের পক্ষে যথেষ্ট ছিল। উপবাসী মনকে দীর্ঘকাল বিদেশী ভাষার চড়াই পথে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে দম হারিয়ে চল্‌তে হয় নি, শেখার সঙ্গে বোঝার প্রত্যহ সংঘাতিক মাথা-ঠোকাঠুকি না হওয়াতে আমাকে বিদ্যালয়ের হাঁসপাতালে মানুষ হোতে

হয়নি। এমন কি, সেই কাঁচা বয়সে যখন আমাকে 'মেঘনাদবধ' পড়তে হয়েছে তখন একদিন মাত্র আমার বাঁ গালে একটা বড়ো চড় খেয়েছিলুম, এইটেই একমাত্র অবিস্মরণীয় অপঘাত; যতদূর মনে পড়ে মহাকাব্যের শেষ সর্গ পর্য্যন্তই আমার কানের উপরেও শিক্ষকের হস্তক্ষেপ ঘটেনি, অথবা সেটা অত্যন্তই বিরল ছিল।

কৃতজ্ঞতার কারণ আরো আছে। মনের চিন্তা এবং ভাব কথায় প্রকাশ করবার সাধনা শিক্ষার একটি প্রধান অঙ্গ। অন্তরে বাহিরে দেওয়া নেওয়ার এই প্রক্রিয়ার সামঞ্জস্য সাধনই সুস্থ প্রাণের লক্ষণ। বিদেশী ভাষাই প্রকাশ-চর্চ্চার প্রধান অবলম্বন হোলে সেটাতে যেন মুখোষের ভিতর দিয়ে ভাব প্রকাশের অভ্যাস দাঁড়ায়। মুখোষ-পরা অভিনয় দেখেছি, তাতে ছাঁচে-গড়া ভাবকে অবিচল ক'রে দেখানো যায় একটা বাঁধা সীমানার মধ্যে, তার বাইরে স্বাধীনতা পাওয়া যায় না। বিদেশী ভাষার আবরণের আড়ালে প্রকাশের চর্চ্চা সেই জাতের। একদা মধুসূদনের মতো ইংরেজি বিদ্যায় অসামান্য পণ্ডিত এবং বঙ্কিমচন্দ্রের মতো বিজাতীয় বিদ্যালয়ের

কৃতী ছাত্র এই মুখোষের ভিতর দিয়ে ভাব বাৎলাতে চেষ্টা করেছিলেন ; শেষকালে হতাশ হয়ে সেটা টেনে ফেলে দিতে হোলো।

রচনার সাধনা অম্‌নিতেই সহজ নয়। সেই সাধনাকে পরভাষার দ্বারা ভারাক্রান্ত করলে চির-কালের মতো তাকে পঙ্গু করার আশঙ্কা থাকে। বিদেশী ভাষার চাপে বামন-হওয়া মন আমাদের দেশে নিশ্চয়ই বিস্তর আছে। প্রথম থেকেই মাতৃ-ভাষার স্বাভাবিক সুযোগে মানুষ হোলে সেই মন কী হোতে পারত আন্দাজ করতে পারিনে ব'লে তুলনা করতে পারিনে।

যাই হোক্, ভাগ্যবলে অখ্যাত নর্ম্মালস্কুলে ভর্ত্তি হয়েছিলুম, তাই কচিবয়সে রচনা করা ও কুস্তি করাকে এক ক'রে তুলতে হয়নি ; চলা এবং রাস্তা-খোঁড়া ছিল না এক সঙ্গে। নিজের ভাষায় চিন্তাকে ফুটিয়ে-তোলা সাজিয়ে-তোলার আনন্দ গোড়া থেকেই পেয়েছি। তাই বুঝেছি মাতৃভাষায় রচনার অভ্যাস সহজ হয়ে গেলে তার পরে যথাসময়ে অন্য ভাষা আয়ত্ত ক'রে সেটাকে সাহসপূর্ব্বক ব্যবহার করতে কলমে বাধে না, ইংরেজির অতিপ্রচলিত জীর্ণ

বাক্যাবলী সাবধানে শেলাই ক'রে ক'রে কাঁথা বুন্‌তে হয় না। ইস্কুল-পালানে অবকাশে যেটুকু ইংরেজি আমি পথে-পথে সংগ্রহ করেছি সেটুকু নিজের খুসিতে ব্যবহার করে থাকি ; তার প্রধান কারণ শিশুকাল থেকে বাংলাভাষায় রচনা করতে আমি অভ্যস্ত। অন্তত আমার এগারো বছর বয়স পর্য্যন্ত আমার কাছে বাংলাভাষার কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল না। রাজসম্মানগর্ব্বিত কোনো সুয়োরাণী তাকে গোয়ালঘরের কোণে মুখচাপা দিয়ে রাখেনি। আমার ইংরেজি শিক্ষায় সেই আদিম-দৈন্যসত্ত্বেও পরিমিত উপকরণ নিয়ে আমার চিত্তবৃত্তি কেবল গৃহিণীপনার জোরে ইংরেজি-জানা ভদ্রসমাজে আমার মান বাঁচিয়ে আসছে ; যা-কিছু ছেঁড়া ফাটা, যা-কিছু মাপে খাটো তাকে কোনো রকমে ঢেকে বেড়াতে পেরেছে ; নিশ্চিত জানি তার কারণ শিশুকাল থেকে আমার মনের পরিণতি ঘটেছে কোনো-ভেজাল-না-দেওয়া মাতৃভাষায় ; সেই খাদ্যে খাদ্যবস্তুর সঙ্গে যথেষ্ট খাদ্য-প্রাণ ছিল, যে খাদ্য-প্রাণে সৃষ্টিকর্ত্তা তাঁর জাদুমন্ত্র দিয়েছেন।

অবশেষে আমার নিবেদন এই যে, আজ কোনো

ভগীরথ বাংলাভাষায় শিক্ষাস্রোতকে বিশ্ববিদ্যার সমুদ্র পর্য্যন্ত নিয়ে চলুন, দেশের সহস্র সহস্র মন মূর্খতার অভিশাপে প্রাণহীন হয়ে পড়ে আছে ; এই সঞ্জীবনী-ধারার স্পর্শে বেঁচে উঠুক্, পৃথিবীর কাছে আমাদের উপেক্ষিত মাতৃভাষার লজ্জা দূর হোক্, বিদ্যাবিতরণের অন্নসত্র স্বদেশের নিত্যসম্পদ হয়ে আমাদের আতিথ্যের গৌরব রক্ষা করুক।

জানিনে, হয়তো অভিজ্ঞ ব্যক্তি বলবেন একথাটা কাজের কথা নয়, এ কবি-কল্পনা। তা হোক্, আমি বল্‌ব, আজ পর্য্যন্ত কেজো-কথায় কেবল জোড়া-তাড়ার কাজ চলেছে, সৃষ্টি হয়েছে কল্পনার বলে।

## পুনশ্চ

বাংলাদেশের শিক্ষা-সচিব মাননীয় মোঃ আজিজুল হক মহাশয়কে নূতন শিক্ষাবিধিপ্রণয়ন সম্পর্কে যে-পত্রটি লেখা হয়েছিল, নিম্নে তার অংশ-বিশেষ প্রকাশ করা গেল।

### দ্বিতীয় প্রস্তাব

······আমার আর একটি প্রস্তাব আমাদের শিক্ষা-বিভাগের সম্মুখে আমি উপস্থিত করতে চাই। দেশের যে-সকল পুরুষ ও স্ত্রীলোকেরা নানাকারণে বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভের সুযোগ থেকে বঞ্চিত, তাদের জন্যে ছোটোবড়ো প্রাদেশিক সহরগুলিতে যদি পরীক্ষাকেন্দ্র স্থাপন করা যায় তবে অনেকেই অবসরমতো ঘরে ব'সে নিজেকে শিক্ষিত করতে উৎসাহিত হবে। নিম্নতন থেকে উচ্চতন পর্ব্বপর্য্যন্ত তাদের পাঠ্যবিষয় নির্দ্দিষ্ট ক'রে তাদের পাঠ্যপুস্তক বেঁধে দিলে সুবিহিত ভাবে তাদের শিক্ষা নিয়ন্ত্রিত হোতে পারবে। এই পরীক্ষার যোগে যে-সকল উপাধির অধিকার পাওয়া যাবে, সমাজের দিক থেকে

তার সম্মান ও জীবিকার দিক থেকে তার প্রয়োজনীয়তার মূল্য আছে। তাই আশা করা যায়, দেশব্যাপী পরীক্ষার্থীর দেয় অর্থ থেকে অনায়াসে এর ব্যয় নির্ব্বাহ হবে। এই উপলক্ষ্যে পাঠ্যপুস্তক রচনার ক্ষেত্র প্রসারিত হয়ে জনসাধারণের মধ্যে বিদ্যাবিস্তারের উপাদান বেড়ে যাবে এবং এতে ক'রে বিস্তর লেখকের জীবিকার উপায় নির্দ্ধারিত হবে। একদা বিশ্বভারতী থেকে এই কর্ত্তব্য গ্রহণ করবার সঙ্কল্প মনে উদয় হয়েছিল কিন্তু দরিদ্রের মনোরথ মনের বাইরে অচল। তা ছাড়া রাজসরকারের উপাধিই জীবনযাত্রায় কর্ণধার।

---

# শিক্ষার স্বদেশী রূপ

শ্রীক্ষিতিমোহন সেন

# শিক্ষার স্বদেশী রূপ

জ্ঞানের জন্য ব্যাকুলতা ভারতের চিরন্তন ধর্ম্ম। উপনিষদাদি গ্রন্থে আমরা দেখিতে পাই তখনকার দিনে শিক্ষালাভের জন্য কি তীব্র আগ্রহ। কাশী বিদেহ পাঞ্চাল প্রভৃতি স্থান তখন ক্রমে উঠিতেছে বিশ্ববিদ্যালয়ের আদিভূমি হইয়া। ভিন্ন ভিন্ন শিক্ষা পদ্ধতি ও গুরুপরম্পরা যে ক্রমে গড়িয়া উঠিতেছে তাহার সন্ধানও আমরা পাই উপনিষদে। এই সকল শিক্ষালয়ের দ্বার নারীদের কাছেও ছিল অবারিত। তখনকার শিক্ষা-ক্ষেত্র ছিল তপোবনে।

ক্রমে তপোবনের স্থানে গড়িয়া উঠিতে লাগিল জৈন ও বৌদ্ধ শিক্ষায়তনগুলি। সেখানেও সাধনা গুরু ও শিষ্যের মর্ম্মগত যোগ লইয়া। কি ব্রহ্মচর্য্যের যুগে কি বৌদ্ধ যুগে শিক্ষার সব ভার সমাজই করিয়াছে বহন। গুরু শিষ্য সবাই সমাজের পালনীয়। কারণ গ্রীকদের মত জ্ঞান আমাদের দেশে ব্যক্তিগত সম্পত্তি নহে। ইহার ক্রয় বিক্রয় চলে না। জ্ঞান ছিল এদেশে সবারই সাধনার ধন, সাধারণ সম্পদ।

বৌদ্ধ রাজত্ব হীনবল হইয়া আসিলে বৌদ্ধ বিশ্ব-

বিদ্যালয়গুলিও আসিল ক্ষয়িষ্ণু হইয়া। তখন শৈব শাক্ত বৈষ্ণবাদির মতের গুরুগণ আপন আপন স্থানে বসিয়াই দিতে লাগিলেন শিক্ষা। ক্রমে ভারতীয় শিক্ষা ও কালচার আসিয়া আশ্রয় লইল চতুষ্পাঠীগুলিতে। বিগত কয়েক শতাব্দী ধরিয়া এই চতুষ্পাঠীগুলিই এই দেশে জ্ঞানের প্রদীপ রাখিয়া দিল জ্বালাইয়া। চতুষ্পাঠীগুলির প্রাণের পরিচয় আজ কয় জন জানেন?

১৮০০ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি W. Ward নামে একজন ইংরাজ, "History, Literature and Mythology of the Hindus" নামে একখানি গ্রন্থ লেখেন। যদিও তাঁর চিত্ত এই দেশের শিক্ষা দীক্ষার প্রতি অনুকূল ছিল না তবু তিনি এই চতুষ্পাঠীগুলিকে কলেজ বলিয়াই অভিহিত করিয়াছেন। তিনি কাশীর এইরূপ ৮০টি কলেজের ও বাংলা দেশের শতাধিক কলেজের পরিচয় দিয়াছেন। তবু পূর্ব্ববঙ্গ মিথিলা প্রভৃতির কোন খবর তাঁহার জানাই ছিল না। তিনিও চতুষ্পাঠীগুলির বাহিরের পরিচয়ই দিয়াছেন, ভিতরের পরিচয় তাঁর জানার সম্ভাবনাও ছিল না।

অতি প্রাচীন যুগের জ্ঞান-দীপ্ত কাশী মধ্যযুগে যখন হতগৌরব হইয়া আসিল তখন নব নব চতুষ্পাঠী স্থাপন করিয়াই নূতন করিয়া কাশীকে উদ্বোধিত করিয়া

তুলিলেন দুই বিধবা তপস্বিনী—অহল্যা বাই ও রাণী ভবানী। তাঁহারা প্রত্যেকে প্রতিদিন একটি করিয়া বাড়ী ভূবৃত্তিসহ দান করিয়া ৩৬০ জন অধ্যাপককে কাশীতে করিলেন প্রতিষ্ঠিত। কাশী নবজীবন লাভ করিল।

আজও কাশীতে ভারতের প্রাচীন জ্ঞান ধ্যানকে জাগাইয়া রাখিয়াছেন এই সব মহাজ্ঞানী পণ্ডিতের দল। তাঁহাদের অধিকাংশই আজ যে কি দারিদ্র্যের মধ্যে জীবন যাপন করেন তাহা আপনাদের ধারণারও অতীত। অথচ আমাদের অন্ধভক্তির মোটা মোটা দানে পরিপুষ্ট কাশীর পাণ্ডা প্রভৃতির দল। আদর্শভ্রষ্ট এই সব তীর্থগুরুরা নিজেরাও চলিয়াছে রসাতলে, সমাজকেও টানিয়া চলিয়াছে সঙ্গে সঙ্গে।

তবু আজও কাশীতে চতুষ্পাঠীর অন্ত নাই। কাশীর এক একটি অংশ এক একটি দেবালয়ের অধীন বা অন্তর্গৃহ। পূর্ব্বে নিয়ম ছিল এক এক অন্তর্গৃহের অধ্যাপকগণ এক এক সময় একত্র হইয়া নিজ নিজ বিষয় ও শিক্ষার সময় স্থির করিয়া লইবেন। অন্য অন্য অন্তর্গৃহের মহামহা অধ্যাপকদের শিক্ষা ব্যবস্থার সঙ্গেও যোগরক্ষা করা হইত। তাই ছাত্ররা আপন ও অন্য অন্তর্গৃহে যথাভিলষিত ভাবে পাঠ গ্রহণ করিতে পারিতেন। মন্দিরে মন্দিরে দণ্ডঘণ্টাগুলিই সময় নির্দ্দেশ করিয়া দিত। দারিদ্র্যের মধ্যেও গুরুজনের

স্নেহ ও কাশীর নিত্য নব নব উৎসব তাঁহাদের মনকে রাখিত সরস করিয়া। কাশী প্রভৃতি তীর্থগুলির চতুষ্পাঠীর ব্যবস্থা ও শিক্ষাবিধান আমাদের এখনও যত্ন করিয়া অনুসন্ধান করার যোগ্য। ন্যায়বাদার্থ ব্যাকরণ প্রভৃতি শাস্ত্র সাধারণের পক্ষে নীরস ও অনধিগম্য হইলেও পুরাণ কথা, ধর্ম্মতত্ত্ব প্রভৃতি সরস ও সরল করিয়া সহজ ভাষায় প্রতিদিন নানা স্থানে সাধারণ লোকের কাছে ধরা হইত। সাধারণ লোকও সথাসাধ্য এই সব শিক্ষার ব্যবস্থাকে ভক্তিভরে প্রতিপালন করিত। পণ্ডিত ও প্রাকৃতজনের মধ্যে প্রাণের নাড়ীর ছিল একটি সহজ ও সরস যোগ।

বাংলাদেশে গুরুর গৃহই চতুষ্পাঠী, সেখানেই ছাত্ররা বাস করিতেন। গুরুই তাঁহাদের পিতা, গুরুপত্নীই মাতা। চারিপাশের নির্জ্জন শান্তপ্রকৃতির পরিবেষ্টন তাঁহাদের মনকে রাখিত সদা সরস। গুরুশিষ্য সবাই দরিদ্র, কিন্তু জ্ঞানে ও প্রীতিতে তাঁহাদের ভাণ্ডার ছিল ভরপূর। গুরুগৃহের সঙ্গে প্রেমের এমন একটি যোগ ছিল যে ছাড়িয়া আসিবার সময় ছাত্রেরা চোখের জলে যাইতেন বিদায় লইয়া।

অধ্যাপক আপন সন্তান ও ছাত্রদের লইয়া এক জায়গাতেই খাইতে বসিতেন। গুরুপত্নীগণও আপন সন্তানের ও ছাত্রদের মধ্যে কোনো ইতর বিশেষ

করিতেন না। ছাত্রেরা বাড়ীর ছেলের মতই নানা উপদ্রব করিতেন। উপদ্রব না করিলে গুরুপত্নীগণ দুঃখ করিয়া বলিতেন, "ওদের এখনও পর-পর ভাব যায় নাই।"

গুরুই ছিলেন পিতা আর সতীর্থরাই ভাই, এমন ভাবে একটা সম্পর্ক চিরস্থায়ী হইত। গুরুশিষ্য পরম্পরাতে যেন একটি বৃহৎ পরিবার চলিত। কেহ বড় ভাই, কেহ ছোটো ভাই, কেহ জ্যেঠা, কেহ কাকা—ইত্যাদি। স্নেহ ও আন্তরিকতার আর সীমা ছিল না। তখনকার দিনের গ্রামের স্মৃতির মধ্যে এই সব ছাত্রজীবনের স্নেহের নানা উৎপাত-উপদ্রবের মধুর স্মৃতি করুণ হইয়া ভরিয়া উঠিয়াছিল। দুঃখের কথা আজ আমরা সেই সব কাহিনী ভুলিতে বসিয়াছি।

বিক্রমপুরে এক অধ্যাপকপত্নী ছিলেন ধনীর কন্যা, ছাত্রদের উৎপাত সহনে অনভ্যস্ত। অধ্যাপক স্বামীর গৃহে আসিয়া ছাত্রদের উপদ্রবে তিনি একটু বিচলিত হইলেন। তাঁর শাশুড়ী ইহা টের পাইয়া বলিলেন, "আহা বৌমা, ওরা ঘর বাড়ী ছাড়িয়া আসিয়াছে। এই তো তাদের বাড়ী ঘর। আপন ঘর মনে করিয়া যদি একটু অত্যাচার করে, তাতেই যদি বাপ মায়ের কথা একটু ভুলিয়া থাকে তবে না হয় একটু করুক।" সেই অধ্যাপকপত্নী নিজেই বৃদ্ধ বয়সে

আমাদের কাছে তাঁর প্রথম বয়সের অসহিষ্ণুতার কথা বলিয়া দুঃখ করিয়াছেন।

কাশীতে কেশব শাস্ত্রী নামে ছিলেন এক মহারাষ্ট্র দেশীয় অধ্যাপক। তিনি বিপত্নীক ও নিঃসন্তান। তাঁর এক ভগ্নী ছিলেন গৃহের কর্ত্রী, সবার তিনি "বুরা" বা পিসিমা। কেশব শাস্ত্রী ছিলেন মহামান্য পণ্ডিত; নানা স্থান হইতে আগত ফলমূল মিষ্টদ্রব্যে তাঁর ঘর সদাই পূর্ণ থাকিত। দুধ সর প্রভৃতির ও কোনো অভাব ছিল না। আমরা যদি উৎপাত করিয়া সেইসব লুটপাট করিয়া না খাইতাম তবে পিসিমা দুঃখ করিয়া বলিতেন, "এখন কি আর ছেলেরা তেমন করিয়া সকলকে আপনার করিয়া লইতে পারে? আগে কি আমার শিকাগুলি এমন করিয়া পূর্ণ থাকিতে পারিত?"

এইরূপ স্নেহ ও সহৃদয়তা ছিল অধ্যাপকগণের ঘরে ঘরে। কাশী হইতে চলিয়া আসার কয়েক বৎসর পর একটা জনরব উঠিল আমি মারা গিয়াছি। তারপর কাশীতে হঠাৎ খবর গেল যে কথাটা মিথ্যা। তবু অধ্যাপকগণের মধ্যে যাঁহারা জীবিত ছিলেন তাঁহারা লিখিয়া পাঠাইলেন আমাকে কাশী যাইতে। আমাকে দেখিয়া সকলে কি খুসী! সর্ব্বাঙ্গে হাত বুলাইয়া মায়ের মত কত আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন।

যেমন ছিল তাঁহাদের অপরিসীম স্নেহ তেমনি ছিল

অপরিমেয় জ্ঞান ও অটল কর্ত্তব্য-নিষ্ঠা। বিশ্ববিশ্রুত গঙ্গাধর শাস্ত্রী মহাশয়ের একমাত্র পুত্র ঢুংঢরাজ ছিলেন আমাদের অন্তরঙ্গ বন্ধু। হঠাৎ অসুখে তিনি মারা গেলেন। আমরা কেহই জানিনা। শাস্ত্রী মহাশয় যথারীতি অধ্যাপনা করিলেন; কিন্তু তাঁহাকে হঠাৎ মনে হইল অত্যন্ত জীর্ণ। যখন ঢুংঢরাজের খোঁজে গেলাম তখন তিনি বলিলেন, "বাবা, এমন স্থানে তিনি গিয়াছেন যেখানে তোমাদের কণ্ঠ পৌঁছিবে না।" প্রথমে বুঝিতে পারিলাম না। যখন বুঝিলাম, তখন বলিলাম, "তবে আপনি অধ্যাপনা বন্ধ করিলেন না কেন?" তিনি বলিলেন, "বাবা, নানা স্থানের শত শত বিদ্যার্থী এখানে সমাগত, তাহাদের শত শত মুহূর্ত্ত নষ্ট করিবার কি অধিকার আছে আমার? শোক আমার একলার, সাধনা সকলের। সবার সাধনা ব্যাহত করিতে পারি এমন অধিকার তো আমার নাই।" তাঁহার অটল নিষ্ঠা দেখিয়া স্তম্ভিত হইলাম।

গুরু-শিষ্যের মধ্যে যে স্নেহ-শ্রদ্ধা তখন দেখিয়াছি তাহা এখন ধারণা করা কঠিন। একবার গঙ্গাধর শাস্ত্রী মহাশয়ের গৃহে অধ্যয়নের নিমিত্ত আমরা প্রতীক্ষা করিতেছি, শাস্ত্রী মহাশয় ভিতরে আছেন, এমন সময় এক অপরিচিত অতিবৃদ্ধ পণ্ডিত আসিয়া উপস্থিত। আমরা তাঁহাকে যথারীতি পাদ্যাদি দিয়া অভ্যর্থনা করিলাম।

শাস্ত্রী মহাশয় বাহিরে আসিয়া তাঁহাকে বয়োজ্যেষ্ঠ দেখিয়া অর্চ্চনা করিতে গেলে তিনি বলিলেন, "থামুন, আপনিই বিচার করিয়া বলুন আমি আপনার সপর্য্যা গ্রহণ করিতে পারি কি না। আমি আপনার পিতৃদেবের সতীর্থ। এক রাজার ধর্ম্মাধিকরণের ভার লইয়া আমি কাশী ছাড়িতে বাধ্য হই। তখন আমার কতকগুলি গ্রন্থ অর্দ্ধ-অধীত ছিল। বহুবৎসর পরে আমি কাশীতে পুনরাগত। গুরু পরম্পরাগত 'দেশনা' দিতে সমর্থ আমাদের মধ্যে একমাত্র আছেন আপনি। তাই মনে করিয়াছি আপনার কাছে ঐ গ্রন্থ কয়খানা সমাপ্ত করিব। তাই সতীর্থপুত্র হইলেও আপনি আমার ভাবী গুরু। অপনার সপর্য্যা গ্রহণ করা কি উচিত হইবে?"

শাস্ত্রী মহাশয় বলিলেন, "বহুদিন আমি পিতৃহীন। আজ পরম ভাগ্যবলে আমার গৃহে তাঁহার সতীর্থ সমাগত, এমন শুভযোগ কি আমি উপেক্ষা করিতে পারি? অথচ আপনি অভ্যাগত দেশনার্থী, কাজেই অপ্রত্যাখ্যেয়। তিন দিন আপনি আমার সৎকার স্বীকার করুন, তারপর আপনি না হয় পাঠ গ্রহণ করিবেন।"

তিন দিন তাঁহার সৎকার চলিল। চতুর্থ দিনে দর্ভপাণি হইয়া তিনিও অন্যান্য ছাত্রদের সঙ্গে বসিয়া

পাঠগ্রহণ করিলেন এবং পাঠান্তে ভূমিগতপ্রণতিপূর্ব্বক বিদায় লইলেন। শ্রদ্ধার সেই অনুপম চিত্রটি চিরদিন আমার মনে জীবন্ত থাকিবে। শ্রদ্ধাই আমাদের দেশের সাধনার প্রাণ। গুরুশিষ্যের মধ্যে যোগের মর্ম্মবস্তুই ছিল এই শ্রদ্ধা।

স্নেহ, নিষ্ঠা ও শ্রদ্ধা ছাড়া চতুষ্পাঠীর একটি বিশেষত্ব ছিল তাহার শুচিতা। আমাদের দেশে পাঠশালা প্রভৃতি নানা বিদ্যায়তনে তখনকার দিনে মারধর গালাগালি তাড়ন ভর্ৎসনন কটুভাষণ প্রভৃতি লাগিয়াই ছিল। পাঠশালা প্রভৃতিতে এই সব বালাই কোথা হইতে আমদানী হইল তাহা বলিতে পারি না। কিন্তু চতুষ্পাঠী ছিল এই সব মলিনতা হইতে চিরদিন মুক্ত। পড়াইতে পড়াইতে হঠাৎ কোনো অশুচি কথা মুখ দিয়া বাহির হইয়া পড়িলে গুরু তৎক্ষণাৎ অধ্যাপনা স্থগিত রাখিয়া আচমন করিয়া ভগবৎস্মরণ করিয়া পুনঃ অধ্যাপনে প্রবৃত্ত হইতেন। "অপভাষা" অর্থাৎ অশুচি কথা একটা প্রায়শ্চিত্তীয় অপরাধ। গুরুতর "অপভাষা" ঘটিলে সেদিনকার মত পাঠ বন্ধ করিয়া পরদিন কৃতস্নান ও কৃতাচমন হইয়া পুনরায় পাঠারম্ভ করা হইত।

এই প্রসঙ্গে আমার পিতামহের সমকালীন বিক্রম-পুরের অদ্বিতীয় ধর্ম্মশাস্ত্রগুরু কালীশিরোমণির নাম

চিরস্মরণীয়। এই পূতচরিত্র শুদ্ধাশয় অধ্যাপকটি কাহাকেও "আপনি" ছাড়া "তুমি" বলিয়া সম্ভাষণ করিতে পারিতেন না।

একদা মধ্যাহ্নের পর তিনি অধ্যাপনার্থ বাহির বাড়ী যাইতেছেন এখন সময় দূর হইতে শুনিলেন ঘরে বসিয়া তাঁহার ছাত্রদের মধ্যে একজন অন্যকে একটু কুৎসিত ভাষাতে রসিকতা করিলেন। তিনি যে আসিতেছেন তাহা তাঁহারা জানিতে পারেন নাই। তখন একটি কুকুর পথে শুইয়া ছিল। শিরোমণি মহাশয় সেই কুকুরটিকে বলিলেন, "মহাশয় একটু উঠিয়া পথ ছাড়িয়া দিবেন কি ?" ছাত্রেরা ভাবিলেন, "শিরোমণি মহাশয় আবার কথা বলেন কার সঙ্গে ?" বাহিরে আসিয়া দেখেন শিরোমণি মহাশয় কুকুরের সঙ্গে সম্ভাষণে রত।

বিস্ময়াপন্ন ছাত্রদের দিকে চাহিয়া শিরোমণি মহাশয় বলিলেন, "বাবা, কুকুরকে কি আমি গালি দিয়া উঠাইতে পারিতাম না ? সেতো আর প্রতিবাদ করিতে পারিত না। কিন্তু প্রতিদিন মলিন বচনে অভ্যস্ত হইলে রসনা হইত অশুচি ও অসতর্ক। হয় তো একদিন হঠাৎ মান্য-জনকেও করিতাম অপশব্দ প্রয়োগ। সঙ্গত-অসঙ্গত স্থান-কাল-পাত্র বিবেচনা কি সব সময় থাকিত ? সেই রূপ দুর্গতি হইতে আত্মরক্ষার জন্যই এই সাবধানতা।" ছাত্রেরা

তখন আসল কথাটা বুঝিতে পারিয়া মাথা হেঁট করিয়া রহিলেন।

সংস্কৃত বা প্রাকৃত সাহিত্যে কোনো গ্রন্থেই গুরু শিষ্যের মধ্যে তাড়ন পীড়ন বা অপভাষণের একটুও উল্লেখ নাই। সিন্ধু হইতে বঙ্গ ও কাশ্মীর হইতে কুমারিকা পর্য্যন্ত ভারতের কোনো প্রদেশে বর্ত্তমান বা পুরাতন কোনো যুগে গুরু-শিষ্যের এই পবিত্র সম্বন্ধ এই রূপ কোনো মলিনতার দ্বারা দূষিত হয় নাই।

গুরু-শিষ্যের মধ্যে চির দিনই সম্বন্ধ ছিল স্নেহ ও শ্রদ্ধার। এই ভাবরসের মধ্য দিয়াই গুরু যে জ্ঞান দিতেন শিষ্য সেই জ্ঞান সহজ ভাবে পাইতেন। জঠরের জারক রসে দ্রব না হইলে দেহ যেমন খাদ্যকে স্বীকার করিতে অসমর্থ তেমনি প্রীতি ও শ্রদ্ধার প্রাণরসে দ্রব না হইলেও চিন্ময় অন্ন হয় না আপনার।

এই রূপ কত কাহিনীই আর বলিব? এই সামান্য দিগ্‌দর্শনের দ্বারাই তখনকার ভাবটি বুঝা যাইবে।

চতুষ্পাঠীগুলির প্রতি শ্রদ্ধা থাকা সত্ত্বেও এ কথা বলিতে পারিব না যে এখন তাহাদের সম্বন্ধে আমাদের করণীয় কিছুই নাই। এখন চতুষ্পাঠীগুলি সমাজের সহায়তা ও শ্রদ্ধা হারাইয়াছে। গুরু তখনকার দিনে দরিদ্র হইলেও গৌরবহীন ছিলেন না। কিন্তু আজ তাঁহারা দুরারাধ্য রাজব্যবস্থা, বড় বড় রাজভৃত্য ও ধনীদের

দ্বারে সাহায্যের ব্যর্থ দরবারের অগৌরবে হইয়াছেন হতমান। আমাদের দেশের ভবিষ্যৎ যাঁহাদের হাতে হইবে রচিত তাঁহাদের এই আত্মাবমানার মধ্যে পাতিত করিয়া আমরাও কিছু বিচক্ষণের কাজ করি নাই।

আমরা দরিদ্র, যথেষ্ট ধন দিতে অসমর্থ, কিন্তু শ্রদ্ধা সম্মানও যদি যোগ্য পাত্রে না দেই তবে তাঁহাদের পাইব কেমন করিয়া ?

আমাদের ভবিষ্যৎ সাধনার জন্য যে সব বাধা জমিয়া উঠিয়াছে চতুষ্পাঠীকে সেই সব হইতে মুক্ত করিতে হইবে। জাতি বর্ণ নারী পুরুষ নির্বিশেষে চতুষ্পাঠীর দ্বার সকলের কাছেই করিতে হইবে অবারিত। বায়ু আলোক আকাশের ন্যায় শাশ্বত প্রাণ-বস্তুতে সকলেই যে সমান অধিকার।

সে কালে আমাদের চতুষ্পাঠীতে যাহা যাহা অধীত হইত তাহাই এখনও আমাদের পক্ষে যথেষ্ট, এমন কথাও বলিতে চাহিনা। জীবন যাত্রা এখন হইয়া দাঁড়াইল জীবন যুদ্ধ। দেশী-বিদেশী কোনো সম্বলকেই যে আর উপেক্ষা করা চলিবে না তাহা বুঝিবার দিন আজ সমুপস্থিত। এখানে কোনো সর্বনাশা আত্মঘাতী সঙ্কীর্ণ বুদ্ধিকে প্রশ্রয় দেওয়া চলিবে না। আজ জগতের সর্বস্থানের সর্ববিধ জ্ঞান বিজ্ঞান সাহিত্য কলা ইতিহাস দর্শনাদিকে দ্বার খুলিয়া লইতে হইবে আবাহন করিয়া।

আমাদের জ্ঞানসাধনা ও কর্ম্মসাধনার ক্ষেত্রকে সর্ব্ববিধ সঙ্কীর্ণ সংস্কার ও বন্ধন হইতে করিতে হইবে মুক্ত, কারণ বন্ধন অর্থই মৃত্যু।

বিদেশ হইতে প্রাচীনকালে যখন রোমক প্রভৃতি জ্যোতিষের সিদ্ধান্ত এই দেশে আসিল তখন চতুষ্পাঠিতেই তাহারা আশ্রয় পাইল বলিয়া দেশের অন্তরে এত সহজে প্রবেশলাভ করিল। আজ আমাদের সমস্যার অন্ত নাই। সেই হিসাবে চতুষ্পাঠীর ক্ষেত্রটি আমাদের পক্ষে যথেষ্ট প্রশস্ত নহে। সনাতনী জেদবশতঃ এই সঙ্কীর্ণতাকে রক্ষা করিতে গিয়া যদি আমরা জগতের নানা-বিধ জ্ঞান বিজ্ঞানে বঞ্চিত হই তবে আমাদের কপালে আছে নিশ্চিত মৃত্যুদণ্ড। আবার আধুনিকতার মোহে যদি আমরা আমাদের চিরন্তন স্বাভাবিক মর্ম্মগত পন্থাকে অন্যায়ভাবে উপেক্ষা করি তবে জগতের সর্ব্ববিধ সম্পদ আপনার করিয়া লইব কি উপায়ে? এই পন্থাকে যদি আমরা হারাই তবে সেই ক্ষতির আর কখনও পূরণ হইবে না।

চতুষ্পাঠিগুলিকে এমন প্রশস্ত করা দরকার যে তাহাতে যেন জগতের সকল জ্ঞান বিজ্ঞানের আশ্রয় সহজে মেলে। ইহারই সহায়তায় বিদেশগত সব জ্ঞান বিজ্ঞান শাস্ত্রবদ্ধ যান্ত্রিকতা হইতে মুক্ত হইয়া গুরুশিষ্যের প্রীতির সম্বন্ধের মধ্যে আসিয়া হইবে মানব-প্রাণ-রসে

অভিষিক্ত ( humanised )। নূতন ও পুরাতনের মধ্যে যদি এই জোড়-কলম বাঁধিতে পারি তবে তাহা এক-দিকে হইবে নব ঐশ্বর্য্যে ঐশ্বর্য্যবন্ত ও অন্যদিকে হইবে চিরন্তন প্রাণধর্ম্মে প্রাণবন্ত।

দরিদ্র এই দেশ ; বহু অর্থব্যয়ে প্রাকৃতজনের চিত্তের সঙ্গে যোগহীন মোটাবেতনভোগী শিক্ষাধিকারীদের পোষণ করিতে অসমর্থ। স্বল্পে সন্তুষ্ট চতুষ্পাঠীর অধ্যাপকেরা যদি দেশ-বিদেশের নানা শাস্ত্র অধ্যাপনা করিয়া প্রাকৃতজনের চিত্তের সঙ্গে নানা ভাবে নাড়ীর যোগ রক্ষা করেন তবেই আমাদের এই দরিদ্র ও দুর্গত দেশের বহু সমস্যার হয় সহজ সমাধান।

এখন চতুষ্পাঠীতে সংস্কৃতের স্থলে বাংলা প্রভৃতি ভাষা-কেই করিতে হইবে মুখ্যতঃ প্রতিষ্ঠা। ভাষাকেই করিতে হইবে সেখানে শিক্ষার বাহন। তবেই দেশের প্রাকৃত জনের হৃদয়ের সঙ্গে তাহার যোগ হইবে আরও সহজ ও সুদৃঢ়।

---